জীবনানন্দের কবিতায় নিসর্গ, নির্জনতা ও নারী

শামীমা নাসরীন*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ : জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যময় অবস্থান নিয়ে আছেন। তাঁর সমকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্তমান ছিলেন। সমবয়সী গুরুত্বপূর্ণ কবিদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ। তাঁদের সবার লেখাতেই নিসর্গ খুব প্রভাববিস্তারী হয়ে এসেছিল। আবার নারীও প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ হয়ে এসেছিল সকলের লেখাতে। কিন্তু সবার লেখা থেকে পৃথক ও অনন্য অবস্থায় ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। এর একটি কারণ 'নির্জনতা'র ব্যবহার। জীবনানন্দ দাশের কবিতা অনেকটাই নির্জনতার স্নিগ্ধতায় ঘেরা। একাকীত্বের সঙ্গে নির্জনতার একটি বড় পার্থক্য আছে। একাকীত্বের মধ্যে থাকে হতাশা, আর নির্জনতার মধ্যে থাকে প্রশান্তি। জীবনানন্দের মধ্যে আছে সেই প্রশান্তির আমেজ। আজকের বিশ্বে এই প্রশান্তি যখন মানুষ অন্বেষণ করছে, তখন জীবনানন্দের কবিতা হতে পারে তাঁদের পরম আশ্রয়। এই প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ রচিত কবিতায় নিসর্গ, নারী আর নির্জনতার পারস্পরিকতা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

চাবিশব্দ : পরাবাস্তববাদ, নারী, নিসর্গ, নির্জনতা, উপলব্ধির স্বকীয়তা।

Abstract: Jibanananda Das (1899-1954) has occupied an extraordinarily significant place in the sphere of modern Bengali poetry. Rabindranath Tagore was contemporary to him. The other conspicuous poets of his same age include Buddha Dev Basu, Sudhindranath Datta, Amiyo Chakrabarty, Bishnu Day and others. "Nature" became greatly influential in the writings of all of them. Moreover, "Women" became the subject and context in their writings too. But Jibanananda Das as a poet became different and unique from them. One of the causes of this is his use of "Solitude". The soothing essence of solitude occupies a great part in the poetry of Jibanananda Das. "Solitude" is far different from "Loneliness". "Loneliness" contains despair but "Solitude" contains serenity. Jibanananda's poems bear the charm of that serenity. In this world when men are in quest of this serenity, Jibanananda's poetry may be their absolute refuge. The correlations among 'Nature', 'Women' and 'Solitude' in the poetry, composed by Jibanananda Das, have been investigated in the article.

---

*প্রভাষক, বাংলা, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা।
ই-মেইল: shamima.nasrin3399@gmail.com

আদিতে পৃথিবী ছিল নিসর্গময়। নির্জনতা ছিল তার আভরণ। আর মানুষের উত্থিত হওয়ার চেতনা থেকে নারী আদ্যাশক্তি হিসেবে নিজেকে করেছে বহুমাত্রিক। সাহিত্য 'সাহিত্য' হয়ে ওঠার পর থেকেই এই সত্যকে আকর ধরে সৃজনের রামধনু সৃষ্টি করেছে।। যখন তা কোনো বিশেষ বিষয়কে উচ্চকিত করেছে, তখন তা সেই নামেই নামাঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ, বিশেষত সৃষ্টিশীল মানুষেরা বায়ুর ভেতরে থেকে জলকেই জীবন বলেছে। স্মরণে আনেনি সূর্য ও আগুন, বায়ুকে তো নয়ই। তাই গোটা বিশ্বে সৃজনকর্মীরা যখনই ভাষাছন্দে পৃথিবীকে আঁকতে চেয়েছেন, তখনই অনিবার্যরূপে নারী, নিসর্গ ও নির্জনতা বাদ দিতে পারেননি। জীবনানন্দ দাশ জীবনকে দেখেছেন বহুবিচিত্রতায়, সম্পূর্ণ নিজস্ব আদলে। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে তিনি জাগুরুক সড়কপথে না চলে আপন পাথেয় নিয়ে পথ চলেছেন প্রকৃতির আত্মধ্যানে। সত্য আহরণে ডাডাইজম (Dadaism) থেকে উৎসারিত পরাবাস্তববাদ (Surrealism) আর বিমূর্ত (Abstract) চেতনাকে আত্মস্থ করে তিনি বাংলা কবিতায় যে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তা চেনা হলেও রূপ পেল নিজস্বতায়। তাকে বলা চলে 'জীবনানন্দীয়'। এখানে তিনি না ভগীরথ, না প্রমিথিউস। আবার সীমিত অর্থে তাও। কেননা বাংলা কাব্যের সূচনা থেকেই নিসর্গ, নির্জনতা ও নারী স্বরূপেই ছিল। *চর্যাপদে* তো বটেই, সেটা মধ্যযুগ হয়ে বর্তমানেও বর্তেছে এবং চলছে। *চর্যাপদে* প্রকৃতি ও নারীর রমণীয় রূপ দেখি ২৮নম্বর পদে :

> উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
> মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহান সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥ (মজুমদার, ২০১৬, পৃ. ১২৮)

আবার ৩৩নম্বর চর্যায় নিসর্গ, নির্জনতা, নারীর মেলবন্ধনে উদঘাটিত হয় দারিদ্র্যের ভয়াল রূপ :

> টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
> হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেসী॥ (মজুমদার, ২০১৬, পৃ. ১৩৫)

এই ধারাবাহিকতায় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে বিশ শতকের তিরিশের দশকে এসে জীবনানন্দ দাশ জীবনের কোথায় কোথায় নিসর্গ, নির্জনতা ও নারীকে দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতিমারূপ দিয়েছেন তা আবিষ্কার করা সম্ভব।

এই গবেষণা-প্রবন্ধের মাধ্যমে মূলত জীবনানন্দ দাশের নারী, নিসর্গ এবং তাদের অস্তিত্বময়তাকে প্রখরও নয়, আবার নিশ্চিহ্নও নয়– দেখানোর প্রয়াস রয়েছে আদ্যশক্তির অবিচ্ছেদ্য আধার অর্থাৎ না থাকার মধ্যেও যে সর্বত্র বিরাজমান, এই দর্শনের নিরন্তর সত্তা হিসেবে। কেননা জীবনানন্দের বনলতারা আটপৌরে নয়, ইচ্ছে করলেই রক্ত-মাংসের অস্তিতে জাগররূপে পাওয়া যায় না। একটি আধিয়ার বহুমাত্রিকতায় ভিন্ন জগতে তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। কারণ সে মানসপ্রতিমা। আবার এ মানসপ্রতিমা কেবল আইডিয়া না, এর বাস্তব স্থিতিও আছে। এই যে অস্তিত্বময়ী নারী, যে বিস্তৃত নিসর্গের মধ্যে বিরাজমান থেকেও নেই, তা যেন জীবনানন্দের চেতনালোকে প্রাণময়ী সত্তারই ভিন্নরূপ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই ইন্দ্রীয়াতীত।

এ প্রবন্ধে বর্ণনামূলক, তুলনামূলক এবং আধেয়রীতিকে আত্মস্থ করে আইডিয়া থেকে বাস্তব, বাস্তব থেকে আইডিয়া, তত্ত্ব থেকে দর্শন, দর্শন থেকে বিমূর্তকে মূর্তরূপে সর্বসত্তায় অনুভব করে, একইসাথে বহুমাত্রিক পাঠক, বোদ্ধা এবং শিল্পীদের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব ঐশীরূপের মেলবন্ধন তৈরির চেষ্টা রয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনার মধ্যেই প্রয়োজনে তুলনা ও আধেয়কে সংশ্লেষণ করে বক্ষ্যমাণ বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সব লেখকই চান তাঁর সৃষ্টিকে একটি প্রমূর্ত তত্ত্বের আধারে প্রকাশ করতে। সেক্ষেত্রে লেখার সংখ্যা নয়, পরিমাণ নয়, বরং প্রমিতি ও উৎকর্ষতার গভীরতাই তত্ত্বের আধার ও আধেয়কে পূর্ণ করে। এক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ উত্তরাধুনিক বাংলা কাব্যের পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যেও মধ্যমণি। কেননা তিনি অব্যক্ত কথায় সব বলার তত্ত্বকেই পরাবাস্তবের আলোকে আলো-আঁধারির মানবিক সত্তা দান করেছেন। এই তত্ত্বটিই আমরা অনুসন্ধান করে ফিরি। এই ফেরার পথ এবং সেখানে অবশ্যম্ভাবী অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা ও বিশ্লেষণের স্পর্ধা উস্কে দেয়াই প্রমাণ করে, জীবনানন্দ দাশের রচনাসমূহ একটি তাত্ত্বিক অবস্থার ইঙ্গিতবহ। এ পথ ধরেই আমরা তাঁর কাব্যমানসবিগ্রহ গড়ে তোলার কুম্ভকারবৃত্তে অবগাহন করে সাগর সেচে মুক্তো আহরণ করি। আর এ মুক্তোই হচ্ছে অলঙ্কারের বিমূর্ততায় সালঙ্কারা চিরআরাধ্য মানসপ্রতিমা। যাকে বলা হয়, কাব্যমানসীর অস্তিত্ব। মূলত জীবনানন্দের রচনাসমগ্রে তত্ত্ব ও খণ্ডিত সত্যগুলো এত বেশি সংশ্লিষ্ট যে, বিশ্লেষণেও সে অবিশ্লেষ্যই থেকে যায়। তাই এই তত্ত্বেই তাঁর কবিতা যেমন দর্শনে, তেমনি অনুসন্ধানী পাঠকেও তত্ত্ববদ্ধ।

এক.

১৮৯৯ সাল। কাজী নজরুল ইসলাম, বনফুল ও জীবনানন্দ দাশের জন্মসাল। এ তিন মহারথীর মধ্যে মিল খুঁজতে গেলে দেখি নজরুলের ভাষা উচ্চকিত, বনফুল গদ্যেও কবি এবং সেখানে পরাবাস্তব (Surrealism) না থাকলেও ইঙ্গিতধর্মিতা প্রবল। জীবনানন্দ দাশ আপন নির্জন পথের পথিক। সাহিত্যজগতে তাঁদের পদচারণা সমসাময়িককালে হলেও প্রত্যেকে মোহন সুন্দর স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল। মৃদুভাষী জীবনানন্দ স্বভাবগতভাবেই ছিলেন আপন নির্জন খোলসের অধিবাসী। সে কারণে বিশ্বসাহিত্যস্নাত রবীন্দ্রযুগের Misticism এবং Romanticism জীবনানন্দে এসে Romantic এবং Surrealism এর সাথে মিত্রতা করে নিয়েছে। তাই এ যুগে প্রকৃতি, নির্জনতা, নারী, ইতিহাস-ভূগোলের সাথে মেলবন্ধন তৈরি করে যে নব কাব্যশৈলী সৃষ্টি করে, সেটাই ব্যক্তিক, সামষ্টিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক কাব্যকলার মিলনে গড়ে তুলেছে জীবনানন্দীয় আপন ভুবন। যার ফলে বাংলা কাব্যে একই সঙ্গে তিনি অভিনব ও একক প্রকৃতির স্রষ্টা। এই অভিনবত্বের জন্যই অনেকে জীবনানন্দকে আদিগন্ত বিস্তৃত চিরন্তন প্রকৃতির কবি, আবার কেউ কেউ তাঁকে আত্ম-মনোগত নারীপ্রতিমা সৃষ্টিকারী ভাস্কর, একই সাথে প্রধান পুরোহিত বলেও আখ্যায়িত করেছেন। আমরাও জীবনানন্দের কবিতায় দেখি এক অন্যরকম বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতমন্দ্রিত প্রকৃতির অরূপ শোভাময় নিঃসঙ্গতার পাশাপাশি আধুনিক মানবাত্মা ও নাগরিক মননের অমীমাংসিত সংশয়। অর্থাৎ উদাস করুণ প্রশান্ত অনুভবের সুবিস্তৃত নারী ও প্রকৃতিসংলগ্ন দিগন্ততার কবি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দের অবস্থান নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন :

> কবি মাত্রেরই স্বতন্ত্র কাব্যভঙ্গি থাকে, যাঁর থাকে না তিনি কবি নন, অনুকারক। জীবনানন্দের স্বাতন্ত্র্য বলতে আমি এই কথাটাই বোঝাতে চাই, রবীন্দ্রনাথের আগে যেমন আর কেউ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না, জীবনানন্দের আগেও তেমনি আর কেউ জীবনানন্দ ছিলেন না। [...] রবীন্দ্রনাথের কাব্যভঙ্গি বাংলা ভাষাকে যতোটা প্রকাশ-ক্ষমতা দিয়েছিল, জীবনানন্দের কাব্যভঙ্গি তার চাইতে খানিকটা বেশি দিয়েছে। (ভট্টাচার্য, ২০১৪ : ৯)

দুই.

জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্য *ঝরাপালক* (১৯২৭) থেকে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬), *বনলতা সেন* (১৯৪২) হয়ে *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪), *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮) বা *রূপসী বাংলা* (১৯৫৭), *বেলা অবেলা কালবেলায়* (১৯৬১) এসে কবির বিচ্ছিন্ন প্রকৃতিচেতনা একটি একক সত্তায় উপনীত হয়েছে। *ঝরাপালক* কাব্যের প্রথম কবিতায়ই কবি প্রকৃতি পরিক্রমা শুরু করেছেন 'মৌন নীলের ইশারায়, প্রাণে জেগে ওঠা কামনায়'। (দাশ, ১৯৯৮, পৃ. ১৩২)। সেখান থেকে তিনি ডাক শুনেছেন 'কোন্ যেন এক সুদূর আকাশ গোধূলিলোকের তীর' (দাশ, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৩)-এর। তাই তাঁর রৌদ্র ঝলমল নীলাকাশও নিশীথের নীলে একাকার। *ঝরাপালক* কাব্যের 'অস্তচাঁদে', 'পিরামিড', 'মিশর', 'মরুবালু', 'চাঁদনীতে' প্রভৃতি কবিতায় জীবনানন্দ দূর ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে স্পর্শ করেছেন। কবি যে শুধু বর্তমান যুগের যুগ-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নিভৃতচারী হয়েছেন তা নয়, তিনি ঐতিহ্যসমৃদ্ধ অতীতকে এবং সংশ্লিষ্ট নানা অনুষঙ্গকে ধারণ করে নিজের কাব্যভুবনকে অভিনব উপকরণে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। অতীতকে বর্তমানে এনে কাব্যের সঞ্জীবনী লাবণ্যের শৈল্পিক সাধনা তাঁর মানসিক সংকট লাঘবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাই তাঁর ঐতিহ্যনুভূতি কখনো প্রাচীন ঐতিহ্যের উল্লেখ করে স্বকালে তার ক্রমঅবক্ষয়ে এক বিষণ্নতার প্রকাশে, কখনো প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে উজ্জ্বলতার আবিষ্কার উল্লাসে অভিব্যক্ত। যেমন :

> দূর উর– ব্যাবিলোন্– মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
> কোথা পিরামিডতলে, –ঈসিসের বেদিকার মূলে, [...]
> আমারে দেখেছে সে যে আসীরীয় সম্রাটের বেশে
> প্রাসাদ-অলিন্দে যবে মহিমায় দাঁড়ায়েছি এসে–। (দাশ, ২০০৩, পৃ: ৬১)

নিসর্গের আপন রূপ অঙ্কনে কবির তন্ময় মুগ্ধতাই তাঁকে প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছে। তাই তাঁর দক্ষিণা, নীলিমা, চাঁদনী, অস্তচাঁদ, ডাহুকী, পেঁচা ইত্যাদি যেন গ্রামবাংলার আদিম আদল নিয়ে বিদগ্ধ বিষণ্নতায় সমর্পিত। বাংলার অবারিত স্থানিক নিসর্গ বেয়ে কবিবন্দনার সুর তাই সাগর, নদী, দ্বীপমালা ছুঁয়ে মিশে গেছে বহুবর্ণিল বৈচিত্র্যময় বিশ্বপ্রকৃতিতে :

> আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
> নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
> একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
> একটা দুরন্ত শকুনের মতো। (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২০৯)

কবি এভাবে তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে একই প্রকৃতির বৈজয়ন্তী উড়িয়ে এগিয়েছেন ক্রমাগত। এভাবে নিসর্গ কেবল প্রকৃতিমাত্র না হয়ে *ধূসর পাণ্ডুলিপি*তে এসে প্রেমের পরাগে সিক্ত হয়েছে। 'নির্জন স্বাক্ষর', 'মৃত্যুর আগে', 'মাঠের গল্প', 'পেঁচা' সব কবিতায়ই মুগ্ধ প্রকৃতিপটে এঁকেছেন জীবনের কথা। বাংলার দিন-মাস-কাল, হেমন্ত-কার্তিক-অঘ্রানের রূপময় বৈচিত্র্য কবির ধূসর চোখে পাণ্ডুর চাঁদের মতো জন্মায় ভালোবাসার শিশির। তখন তিনি বলেন :

> প্রথম ফসল গেছে ঘরে,–
> হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে
> শুধু শিশিরের জল;
> অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে
> হিম হয়ে আসে
> বাঁশপাতা– মরা ঘাস-আকাশের তারা! (দাশ, ২০০৩, পৃ. ১০৪)

নিসর্গচেতনা জীবনানন্দে কেবল বিচ্ছিন্ন নয়, সব মিলিয়ে পূর্ণাবয়ব এবং রমণীয়। আর এ পূর্ণতায় বিমুগ্ধ কবিচিত্ত যেন অন্তর থেকেই অকুণ্ঠ চিত্তে উচ্চারণ করেন :

> তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও– আমি এই বাংলার পারে
> র'য়ে যাব; দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে; (দাশ, ২০০৩, পৃ. ১৭৩)

রবীন্দ্রনাথ যেখানে কেবল প্রকৃতিপ্রেমিক, সেখানে জীবনানন্দ প্রকৃতিসচেতন। সেখানে জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণের মতোই প্রকৃতির সজীব সত্তায় বিশ্বাসী। তারই প্রতিধ্বনি :

> ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
> শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে। (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২১১)

এখানে 'ঘাস' শব্দটিকে কবি বারবার ব্যবহার করে যেমন পুনরাবৃত্তি অলংকার সৃষ্টি করেছেন, তেমনি অতিসাধারণ ঘাসকে অনন্যসাধারণ অস্তিত্বে চিত্ররূপময়তা দান করেছেন। তাই ঘাস এখানে একই সাথে অতিসাধারণ ঘাস এবং ব্যাপ্ত জীবনের অসাধারণ প্রতিভাস। এভাবেই জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর পূর্ব ও সমসাময়িক কবিকুলের প্রকৃতি চেতনাকে এড়িয়ে গড়ে তুলেছেন আপন নিসর্গ চেতনার অনিন্দ্য আদল। এই আপন বৈশিষ্ট্যের কারণেই ভাষাসৃজনে, প্রকরণে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা বা অলংকারে জীবনানন্দের প্রকৃতির সাথে প্রাচীন, মধ্যযুগ বা তাঁর পূর্ব যুগের কবিদের বা কবিতার সখ্য থাকলেও অনুকরণ নেই। এখানে তিনি বরং পাশ্চাত্যের লেখক ইয়েটস, ওয়ার্সওয়ার্থ প্রমুখের সহযাত্রী। তাইতো জীবনানন্দীয় নিসর্গের হলুদ তৃণ, বিকাল বেলার ধূসরতা, বিবর্ণ বাদামি পাখি বা ধূসর সন্ধ্যার সাথে ইয়েটস-এর 'Grey twilight', 'Shadowy Hazels Grove', 'Mouse Grey water', 'Yellow leaves' (ত্রিপাঠী, ২০০৩, পৃ. ১২৬) হয়ে মিলে যায়। মিলে যায় অবারিত নিসর্গের নিভাঁজ সৌন্দর্যে অকৃত্রিম সরসতার আদিম মমতায় নাগরিক বৈদগ্ধ্যের একক নিঃসঙ্গ বেদনার অতলান্ত-অপার-অপরিজ্ঞাত সৌন্দর্যানুভূতিতে। তাই জীবনানন্দের প্রকৃতি যতোটা সহজ-সরল প্রাণবন্ত, ততোটাই কোমল-করুণ-নিঃসঙ্গ

বিষণ্নতায় মগ্ন। নিসর্গের বিস্তৃতির ভেতরে তিনি একই সাথে মৌন এবং মুখর সৌন্দর্যের মুগ্ধতায় অনির্বচনীয় অন্তর্জগতের একক বাসিন্দা। এ কারণেই দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছেন :

> পৌষের চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রির প্রকৃতির মতো তাঁর কাব্য কুহেলীকুহকে আচ্ছন্ন। স্বভাবোক্তি অলংকার ও বাক্-প্রয়োগের দেশজ রীতির মিলনে সৃষ্ট তাঁর আপাতসুবোধ্যতার অন্তরালে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য বিরাজিত। বলতে কি, আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কাব্যেই এ যুগের সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পরিচয়টি ফুটে উঠেছে। (ত্রিপাঠী, ২০০৩, পৃ. ১১৭)

তিন.

কল্লোলযুগে যে বিভিন্নমুখী সৃষ্টি প্রবণতা দিয়ে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ রবীন্দ্রবলয় ভেঙে অন্য এক ভুবন সৃষ্টিতে প্রয়াসী হোন, জীবনানন্দ একান্ত নিভৃতে তাঁদেরই সহযাত্রী হয়ে আপন সৃষ্টিশীলতা দিয়ে গড়ে তোলেন সহজাত প্রকৃতির সচেতন সজীব এক অতুল আদল। নবসৃষ্টির অভূতপূর্ব পারঙ্গমতায় জীবনানন্দ দাশ নিসর্গকে প্রতীকী করে গড়েছেন। এর বড় প্রমাণ তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ *রূপসী বাংলা*। যে বাংলার অবিচ্ছেদ্য অনিন্দ্য নিসর্গে কবি নিজেই একক অভিযাত্রী। সেখানে তিনি মিলে গেছেন প্রকৃতির সজীব সত্তায়, এভাবে : 'আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।' (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২০২)। এ আকাশের সূচনা ধূসর পাণ্ডুলিপির দারুচিনি দ্বীপের ভেতর, বনলতার কালোকেশ থেকে মহাকাশের চিরন্তনী *সাতটি তারার তিমির* কাব্যে। সেখান থেকে শিশিরঝরা শব্দের মতো মহাপৃথিবীর বুকে ঝরে ঝরে পড়ে অজানা পাখির অপরূপ *ঝরাপালক*। সে পালক রূপসী বাংলার রূপময় মানসে জাগায় নিঃসঙ্গ বেদনার চিরায়ত সৌন্দর্যের অমিয় ফল্গুধারা। আর ঐ ধারা সিক্ত করে আদিগন্ত অবারিত নিসর্গের স্তব্ধ নিবিড় প্রাণময় বিস্তৃত চৈতন্যকে। এই চৈতন্য থেকেই পরাবাস্তবের যাত্রা শুরু। পরাবাস্তব বলেই জীবনানন্দে বাস্তবতা এত বেশি নান্দনিক, বর্ণময়, বর্ণাঢ্য কিন্তু গীতিময়, সাংকেতিক ও প্রতীকীব্যঞ্জনায় স্পষ্টতই অস্পষ্ট। ম্যাক্স আর্নেস্ট বলেছেন :

> সুররিয়ালিস্টের লক্ষ্য অবচেতনের বাস্তবচিত্র আঁকা নয়; কিংবা অবচেতনার বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে কল্পনার একটি পৃথক জগৎ সৃষ্টিও নয়। তার লক্ষ্য হ'ল চেতন ও অবচেতন, অন্তর ও বহির্জগতের মধ্যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক বেড়া ভেঙে দেওয়া। (ত্রিপাঠী, ২০০৩, পৃ. ১৬২)

যার প্রতিফলন দেখি জীবনানন্দের কবিতার পরতে পরতে। কাব্যশৈলীর এই স্তর থেকে স্তরে পরিভ্রমণ এবং তাদের মধ্যে একটি অদৃশ্য কিন্তু অভূতপূর্ব যোগসূত্র সৃজনের ফলেই জীবনানন্দ এবং তাঁর নিসর্গ একই সাথে চিরচেনা এবং একেবারেই অচেনা। দুর্বোধ্যতার মধ্যেই রয়েছে সুবোধ্যতা। যা স্বপ্নকল্পনাময় অধরা কাব্যলক্ষ্মীকে তিলোত্তমা সৌন্দর্যে স্থিতরূপে আধুনিক পাঠকের কাছে প্রতীকীব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করে। জীবনানন্দের নিসর্গচেতনা একদিকে যেমন সম্পূর্ণ, অন্যদিকে তেমন খণ্ডিত। মূলত খণ্ডাংশের মধ্য দিয়ে তিনি আজীবন পূর্ণতার সাধনা করেছেন। সাহিত্য যেমন বিমূর্ত চেতনার মূর্ত প্রকাশ, তেমনি জীবনানন্দের নিসর্গচেতনাও অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার প্রকাশ। এই মোহন বৈপরীত্যের কারণেই জীবনানন্দ দাশ এবং তাঁর নিসর্গ ও নির্জনতা আমাদের কাছে একই

সাথে অতিচেনা, আবার একেবারেই অচেনা। কেননা তিনি যুগের মানসিকতাকে যোগ্য চিত্রকল্পে ভাষারূপ দিতে পেরেছিলেন। সংশয়সংকুল আধুনিক যুগের কবি হিসেবে তাই তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল বহির্জগত ও অন্তর্জগত ব্যাপ্ত। জীবনানন্দের অন্তর্লোকে যে সমুদ্র মন্থন হয়েছে তারই বিষে তিনি হয়েছেন নীলকণ্ঠ। এজন্যই তাঁর কাব্যে শুচিস্নিগ্ধ এক নস্টালজিক ট্রাজিক মহিমা মর্মন্তুদ হয়ে ধরা দিয়েছে। এখানেই অন্যান্য কবির সাথে জীবনানন্দের পার্থক্য। এক্ষেত্রে কবি ইয়েটস-এর কথাটি সম্পূর্ণ মিলে যায়: "Man can embody truth but he cannot know it." (ত্রিপাঠী, ২০০৩, পৃ. ১১৭)। এই অচেনা মানুষটিই যখন জীবনের সব পূজা সাঙ্গ করে শুধু প্রেমিকার মুখোমুখি হয়, তখন নিরন্ধ্র নীরবতা চিরে যেন কবির প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাসের মতো ভেসে আসে সেই চিরপুরাতন কিন্তু চিরনতুন কথা :

> সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী– ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
> থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২০৭)

চার.

জীবনানন্দের নিসর্গ, নির্জনতা ও নারী একই সঙ্গে চিরায়ত, চিরপুরাতন; চিরন্তন কিন্তু সয়ম্ভূ। কেননা *চর্যাপদের* ডোম্বী, শবরী, কাপালী ইত্যাদি নারীচরিত্র; মধ্যযুগের দেব-দেবীনির্ভর মঙ্গলকাব্যসমূহের নারীরা, বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা, আলাওলের পদ্মাবতী, শাহ মুহাম্মদ সগীরের জুলেখা বা আধুনিক যুগের সাহিত্যবিধাতা রবীন্দ্রনাথের নারীরাও জীবনানন্দে সমরূপ লাভ করেনি। তাঁর কবিতায় নারী এসেছে প্রকৃতির নির্জনতায় একান্ত নিঃসঙ্গ বুনোঘাসের মতো মৃদু সুবাসময় হয়ে। বনলতা সেন এক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যতিক্রম। কারণ তিনি কায়মনোবাক্যে স্বর্গচ্যুত ইভ হলেও অ্যাডামের প্ররোচক নন। তাই বিভ্রান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় সিদ্ধান্তহীন অ্যাডামকেও তিনি জিজ্ঞেস করার স্পর্ধা রাখেন : 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২০৭)। জীবনানন্দের কবিতায় নারীচরিত্রগুলো মূলত বাতাসের অক্সিজেনের মতো। তারা জ্বলতে সাহায্য করে এবং নিজেও জ্বলে, কিন্তু পোড়ে না। কেননা এখানে প্রেম যতটা উচ্চকিত, কাম ততটাই নির্বাসিত। এখানে নারীরা তাঁর উৎসমূল থেকে উৎসারিত আলো-ছায়ার বাসিন্দা। বর্ণাঢ্য উচ্চারণের বাইরে তাঁর নারীরা যতটা মূর্তিময়ী, যতটা প্রাণবন্ত, ততটাই তমসার মসীলিপ্ত। সংশয়-সংকুল আধুনিক যুগের কবি হলেও তিনি ছিলেন ভিন্ন পথের পথিক। তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল বহির্জগত ও অন্তর্জগত ব্যাপ্ত। তাই নারীচরিত্রগুলো মানুষের আত্মা, প্রেম, জাগতিকতাকে জাগিয়েও সবাইকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে অতীন্দ্রিয় স্বর্গলোকে। আর তা করেছে বলেই জীবনানন্দের কবিতায় নারী, নারীত্ব নিয়েও আইডিয়ালিস্টিক হয়ে উঠেছে। এ কারণেই মর্ষকামীরা এখানে তাদের ইপ্সিত নারীকে খুঁজে পায় না। এর শুরু *ঝরাপালকেই* ঝরে পড়েছে। *ধূসর পাণ্ডুলিপিতে* তা হয়েছে আরো ধূসরিত, বনলতায় মূর্তি নিয়ে চিরন্তন প্রশ্নে উচ্চকিত, *রূপসী বাংলায়* মিশে গেছেন মাতৃময়ী স্বদেশের ধূলিমাটিতে। *মহাপৃথিবীতে* তিনি ভূমিকন্যা সীতা প্রায়, *সাতটি তারার তিমিরে* এসে দূরের তারার মতো নিভু নিভু ঝিকিমিকি। এভাবেই নিসর্গ নির্জনতার প্রকৃতি চিরে জীবনানন্দের কাব্যকল্লোলে সবকিছু প্রেমের পরাগে সিক্ত হয়ে গেছে। তাঁর কবিতায় :

ঘরে গেছে চাষা;
ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী,
তবু আমি পেয়েছি যে টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ! (দাশ, ২০০৩, পৃ. ১০৪)

এখানে নারী-আকুতি থাকলেও নারী নেই।

জীবনানন্দের *কবিতার কথা*র পাঠকরা জানেন, তিনি অন্তঃপ্রেরণা দিব্যঅন্তঃকরণ ও পরিশীলিত কবিস্বভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কাব্যে তাই নিসর্গ, নির্জনতা সহজাত হলেও নারী এসেছে প্রথাভেঙে তাঁর মনোভঙ্গির স্মারক হিসেবে। এ জন্যই জীবনানন্দের নারীচরিত্রগুলো হৃদয়ের ঈষদঙ্কুরিত এক অরূপ সংহতির অভূতপূর্ব চিত্রকল্পরূপে পাঠককে সংজ্ঞাতীত প্রতীকী প্রতিমূর্তি দান করেছে। এ বিষয়ে কবির নিজস্ব অনুভূতি–

> সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়– কিংবা প্রভূত-বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যেন ছিল; এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে, আরো অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত, কোথাও যেন রয়ে যাবে; এই সবের অপরূপ উদ্গীরণের ভিতরে এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়, নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তুসঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর। (ভট্টাচার্য, ২০১৭, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮)

পাঁচ.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশের কবিতায় চিত্ররূপময়তা লক্ষ করেছেন। অর্থাৎ জীবনানন্দের কবিভাষা আবহমান নারী প্রকৃতির সৌরভমাধুরিমা এবং লালিত্য নিয়েও অলংকারের অহংকারে প্রতিমাপ্রতিম। এই প্রতিমা যুগের মাঝে থেকেও তিনি নারীসত্তার নির্জন বেদনায় বিমূঢ়। যে নির্জন বেদনা নারীর লালিত্যে প্রকৃতি চেতনার হাত ধরাধরি করে জীবনানন্দ-কাব্যে আরাধ্য অঙ্গনে পৌঁছার মানসিকতায় অক্লেশে ঘুরে বেড়িয়েছে ঐতিহ্যের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ইতিহাসের ধূসর জগত আর মানবহৃদয়ের চিররহস্যময় গহীন অন্দরে অন্দরে। তাইতো তাঁর কাব্যে পেঁচা, চিল, শালিক, মেঠো ইঁদুর, বুনো হাঁস খেলা করে। খেলা করে ধানসিঁড়ি নদী শিশির ভেজা অঘ্রানের প্রান্তর পেরিয়ে কল্লোলিনী কলকাতাকে তিলোত্তমা করবার জন্য পৃথিবীর বনে বনে। শাশ্বত দিনরাত্রির নিবিড় নিসর্গ জুড়ে শিরিষের ডালের ছায়ায় ভিজে ভিজে ধানকাটা মাঠে সাপের খোলসের নীড় পেরিয়ে বিকেলের মেঘ ভেঙে দেবদারু পামের নিবিড় দুপুরবেলা তাঁর অন্তরে জাগ্রত নিসর্গই নারীর অন্তরতম সুখমগ্ন বিষাদে জাগায় মোরগফুলের মতো লাল আগুন। তখন কবি রক্তিম গ্লাসে নগ্ন নির্জন হাতে তরমুজের মদ নিয়ে রূপকথার সেই শঙ্খমালাকে দেখেন :

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার!

স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো– দুধে আর্দ্র– কবেকার শঙ্খিনীমালার!
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর। (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২১২)

শঙ্খমালার এ প্রেম আবার প্রকৃতিসংলগ্ন হয়েছে এভাবে :

যেই স্পষ্ট নির্লিপ্তিতে– তাই-ই ঠিক; – ওখানে স্নিগ্ধ হয় সব।
অপ্রেমে বা প্রেমে নয়– নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব। (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২৩১)

ছয়.

বিখ্যাত কবি ও কাব্যসমালোচক বুদ্ধদেব বসু, আবুল হোসেন, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ জীবনানন্দ দাশকে শুধু প্রকৃতির কবিই নয় বরং যুগ ও মানসচেতনার অন্দরে অনন্ত অস্ফুট কথার কবি বলেও আখ্যায়িত করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে বলেছেন 'নির্জনতার কবি' (বসু, ২০০৪, পৃ. ৩১)। কবির নিজের কাব্য উচ্চারণে বিমূর্ত সত্য দুর্বোধ্যতার মাঝেও দুর্লভ সুবোধ্যতায় বাণীরূপ পেয়েছে এমন আর্তবাণী : 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!' (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২১১)। অতঃপর কস্তুরীমত্ত কবি ঐতিহ্যের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন পথ থেকে পথে। মাঝে পেয়েছেন :

জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ!
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল। (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২০৯)

সে রাতে মৃত্যুকে দলিত করে কবি তাঁর আরাধ্য রূপসীর সন্ধানে নক্ষত্রের বানে ভাসা আকাশের নিচে হাজার হাজার বছর ধরে হেঁটেছেন– এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায়। আর এভাবেই তিনি অন্ধকারে কোন বিলুপ্ত নগরীর ধূসর প্রাসাদে গিয়ে দেখেছেন :

পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল;
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী–
এইসব ছিল সেই জগতে একদিন। (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২১৩)

সর্বত্রই জীবনানন্দের নারী ও প্রকৃতি বন্দনা এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে মাখামাখি করে অবশেষে বিষাদ ও মৃত্যুচেতনার মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যে পরিভ্রমণ করেছে। এ ভ্রমণ করতে গিয়ে তাঁর বয়স বেড়েছে, ক্রমশই তিনি এগিয়ে গেছেন গ্রিক, হিন্দু, ফিনিশীয় ইতিহাসের অলিগলি প্রান্তরে প্রান্তরে। সবশেষে আজকের নবসভ্যতায় ফিরে এসে বনলতা সেনকে জিজ্ঞাসা করেন :

ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
'মনে আছে?' শুধালো সে– শুধালাম আমি শুধু 'বনলতা সেন?' (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২২৬)

তারপর :

ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম– পউষের রাতে–

কোনোদিন আর জাগব না জেনে
কোনোদিন জাগব না আমি– কোনোদিন জাগব না আর– (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২১৯)

স্বপ্নের ভিতর বুঁদ হতে গিয়ে আবার মুখ তুলে বলেন :

আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়– বেদনায়– আক্রোশে ভরে গিয়েছে;
সূর্যেও রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের
আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে।
ঘায়, উৎসব! (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২২০)

এমন বিক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ মনে ভ্রমণক্লান্ত কবির কাছে বনলতা সেনকে মনে হয়েছে তাঁর সমস্ত প্রাপ্তির আত্মসমর্পণের স্থান। তাই কান্তার পেরিয়ে সিংহল সমুদ্র থেকে বিদর্ভের বিভ্রমে ঘুরে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর দেবীর বেদিতে বনলতা সেনের মুখোমুখি এসে জীবনানন্দ সমস্ত খোঁজার তৃষ্ণার এবং প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে :

পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী– ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২০৭)

এছাড়া বিচিত্র এক অভিনব বর্ণচেতনাও এ কাব্যে অন্য এক মাত্রা নিয়ে উচ্চকিত হয়েছে। তারই সাতরং বিচ্ছুরণ হয়েছে :

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;
তোমার নগ্ন নির্জন হাত। (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২১৪)

বনলতা সেন কাব্যের এ বহুবর্ণিল নন্দনচেতনার হাত ধরেই অগ্রসর হয়েছে সাতটি তারার তিমির কাব্যটি। এখানেও তিমির আঁধারে খেলা করেছে তিমির বিদারী বর্ণচ্ছটা এবং সংশয়বাদী নৈরাশ্যের পরাবাস্তব প্রকৃতি ও জীবন চেতনা। এখানে কবি নিসর্গকে আড়াল করে দ্বন্দ্বময় মানবভূমিতে অবতীর্ণ। তাই ইতিহাস ও নির্জনতাকে নিয়েই তিনি চলে এসেছেন মানবের মাঝে। ফলে তাঁর কাব্যভঙ্গিতেও যুক্ত হয়েছে ভাব-ভাষার ভিন্নতর মাত্রা:

সেসব ভূখণ্ড ছিল চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার;
একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল
আমাদের দু-জনার মতো দাঁড়াবার
তিল ধারনের স্থান তাহাদের বুকে
আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই; (দাশ, ২০০৩, পৃ. ৩০৪)

এখানে স্বপ্ন আছে, আছে ধ্যানমগ্ন অপার্থিব পরাবাস্তবতার ছোঁয়া। আবার একই সাথে সংশয় ও খণ্ডাংশের মাধ্যমে অখণ্ড সত্তার সাধনা-সম্পাত ঘটেছে। যে সুরঞ্জনার দেখা

মিলেছে বনলতা সেন-এ, তাকে আরেকরূপে পাওয়া যায় সাতটি তারার তিমিরে এসে। এখানে সুরঞ্জনা আদিম ভালোবাসা হতে উৎসারিত হয়ে ভোরের স্নিগ্ধতার মুগ্ধতায় আসন গেড়ে রয়েছে মানব-হৃদয়ে। তাই তার রূপ এখানে ভিন্নতর, ভিন্নরূপময় । যেমন :

তোমার হৃদয় আজ ঘাস:
বাতাসের ওপারে বাতাস–
আকাশের ওপারে আকাশ। (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২৮৩)

এ কাব্যে কবিচিত্ত দ্বন্দ্বময়, যুদ্ধবৈরিতায় তীব্রভাবে আলোড়িত। যুদ্ধ তাঁকে আহত ক্ষুব্ধ করলেও তিনি শান্তির লালিত প্রলেপ খুঁজেছেন উদার প্রকৃতির অফুরান ঐশ্বর্যে। তাই প্রকৃতি বন্দনায় কবি বলেছেন– কামানের থেকে নয়, আজো এইখানে প্রকৃতি রয়েছে। *বনলতা সেন* কাব্যে কবির যে সংশয়ী মানবচেতনা, পাশাপাশি নীড়াশ্রয়ী মানুষের নিরন্তর নীড়ের প্রার্থনা এবং নির্জন প্রকৃতিপূজার মধ্যে বাস্তব হতে পরাবাস্তবে প্রবেশ, তাই-ই যেন Romanticism ত্যাগ করে দ্বন্দ্বময়-গদ্যময় পৃথিবীর তুমুল বাস্তবতার পথ ধরে Surrealicism-এর ধূসর দিগন্ত আরো ব্যঞ্জনাময় ঐক্যে একাকার হয়ে গেছে। যেমন :

মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ;
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন– এখনো ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনাসোর ’পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে একভিড় রাত্রির হাওয়ায়; (দাশ, ২০০৩, পৃ. ২৮৩)

সাত.

আমরা জীবনানন্দ দাশের সৃজনসত্তার অপরিমেয় সম্ভার থেকে যে মূল তিনটি অস্ফুট কোরক নিসর্গ, নির্জনতা ও নারীর স্বরূপ অন্বেষণে বেরিয়েছিলাম, সেখানে এসে দেখি এই তিনটি পথই এসে মিলে গেছে বিমূর্ত আঁধারে মাখা ছাতিম গাছের বনে। এখানে সুসজ্জিত সবুজ পাতায় নিসর্গ খেলা করে আপন মনে। ঝড়ো হাওয়াও ভাঙাতে পারে না তার অতুল নির্জনতা। বিরহী বনলতা নিমিলিত চোখে মিশে যায় মত্ত মদির গন্ধে। তার শরীরে ঝরে ঝরে পড়ে সূক্ষ্ম সফেদ ফুলের পাপড়ি, মদালসা রাত্রির পরে ভোরের নতুন আলোয় মনে হয় নিকানো উঠানে নতুন ফসল। এভাবে সুররিয়ালিজমকে আমরা অসমর্থ ভাষায় মূর্ত করতে গিয়ে নিজেরাই বিমূর্ত হয়ে ঝরাপালকের চোখ মেলে মহাপৃথিবীর পথ অতিক্রম করে সাতটি তারার তিমির ছুঁয়ে বনলতার মতো অক্লেশে মিশে যাই রূপসী বাংলায়। তখন মনে পড়ে না, জীবনানন্দ দাশ তাঁর এই কাব্যভাবনা, দর্শনচেতনা, ভাষার অবয়ব আর তাবৎ কিছু বিশ্বলোক থেকে সংগ্রহ করে আমাদের জন্য বানিয়েছেন বিস্ময়কর কাব্যপ্রতিমা। তাই সাহিত্যজগতে তাঁর নারী, প্রকৃতি ও নির্জনতা নিয়ে এমন একটা আবহ তৈরি হয়েছে যে– জীবনানন্দের নারী চরিত্রগুলো ‘জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা’র মতো উচ্চকিত না হয়েও আবহমান কালব্যাপী বাংলার প্রকৃতিতে স্বকীয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল এবং নির্জন প্রকৃতির মতোই সর্বত্র বিরাজমান হয়ে ওঠে। আর এতেই অনন্ত প্রশান্তির আধার পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র

ত্রিপাঠী, দীপ্তি (২০০৩)। *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দাশ, জীবনানন্দ (১৯৯৮)। *জীবনানন্দ দাশ: কবিতাসমগ্র* (আবদুল মান্নান সৈয়দ, সম্পা.)। অবসর প্রকাশনী, ঢাকা।

দাশ, জীবনানন্দ (২০০৩)। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র* (রবিশঙ্কর মৈত্রী, সম্পা.)। অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

বসু, বুদ্ধদেব (২০০৪)। *কালের পুতুল*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, সঞ্জয় (২০১৪)। *কবি জীবনানন্দ দাশ*। ভারবি, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, সঞ্জয় (২০১৭)। "কবি জীবনানন্দ দাশ", *কবিতার কালপুরুষ* (অসিত কুমার সাহা, মো. সফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা.)। সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ।

মজুমদার, অতীন্দ্র (২০১৬)। *চর্যাপদ*। জয় প্রকাশন, ঢাকা।